

রাজবন বিহারের ‘উদক সীমা’ প্রসঙ্গে

করুণাবংশ ভিক্ষু

১. গোড়ার কথা

বিগত কয়েক মাস আগে আগস্ট মাসের শেষদিকে আমার এক ছাত্র (ভিক্ষু) ও জনৈক মহাস্থবির ভক্তের আলাপের একপর্যায়ে ২০০৮ সালে রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠিত সীমার প্রসঙ্গটি বলতে গেলে হঠাৎই চলে আসে। তিনি কথা প্রসঙ্গে আমার ছাত্রটির কাছে ২০০৮ সালে রাজবন বিহারে সীমা প্রতিষ্ঠার পুরো প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেন। বর্ণনার একপর্যায়ে তিনি বলেন, সীমা প্রতিষ্ঠাকালীন সীমার চারপাশে চতুর্ভুজ আকারে অগভীর নালা খোঁড়া হয়েছিল এবং নালাভর্তি পানি দেওয়া হয়েছিল একদম কিনারা পর্যন্ত। সেই নালাভর্তি পানিকে নির্দেশ করেই (পুরথিমায় দিসায় কিং নিমিত্তং? উদকং ভন্তে। ইত্যাদি আকারে) মোট আটবার ‘উদকনিমিত্ত’ ঘোষণা করা হয়েছিল। সীমার চতুর্পার্শ্বস্থ নালাভর্তি পানিগুলো ছিল একাবদ্ধ, অর্থাৎ মাঝখানে কোনো বিভাজক (ডিভাইডার) মাটি কিংবা অন্য কিছু ছিল না।

উল্লেখ্য, আমার ছাত্রটি ইতিপূর্বে আমার কাছে মূল পিটক, অর্থকথা ও টীকার আলোকে সীমার ব্যাপারে শিক্ষা করেছিল। তাই সে বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল যে, সীমা প্রতিষ্ঠাকালীন উদক নিমিত্ত দেওয়ার প্রক্রিয়ায় গুরুতর সমস্যা আছে। পরে বিষয়টি আমাকে অবগত করা হয়।

প্রথমে আমি বিষয়টিকে উড়িয়ে দিই। আমি তাকে বলি যে, উক্ত মহাস্থবির ভক্তের বর্ণনাটি সঠিক নয়, কারণ আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমার তো সে-রকম কিছু মনে নেই। তারপরও আমি তাকে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভক্তসহ আরও কয়েকজন সিনিয়র ভক্তকে

জিঞ্জেস করার পরামর্শ দিই, উক্ত জনৈক মহাস্থবির ভন্তের বর্ণনার সত্যতা যাচাই করার জন্য। সে-ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভন্তেসহ আরও কয়েকজন সিনিয়র ভন্তেকে জিঞ্জেস করার পর আমাকে জানানো হয় যে, উক্ত জনৈক মহাস্থবির ভন্তের বর্ণনাটি সর্বৈব সত্য।

এরপর আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি নিজে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রগুপ্ত ভন্তেসহ আরও কয়েকজন সিনিয়র ভন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা সবাই আমাকে একই কথা বলেন। তখন আমি বিষয়টির গুরুত্ব ও গভীরতর প্রভাবের কথা উপলব্ধি করে খানিকটা ঘাবড়ে যাই। বিষয়টিকে নিয়ে অধিকতর পড়াশোনা শুরু করি, এবং এ-ব্যাপারে আরও কোথায় কী আছে জানার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে মহাভগ্ন-অট্টকথা, বিনয়সঙ্গহ-অট্টকথা, কঙ্খাষিতরঙ্গী-অট্টকথা, সারথদীপনী-টীকা, বিনয়ালঙ্কার-টীকা ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করি। অল্প কদিনের মধ্যেই অনেক নতুন কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভন্তের সঙ্গে আলাপ করে রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠিত সীমার ব্যাপারে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার নজরে আসে।

এক. সীমার চারপাশে যে নালাটি খোঁড়া হয়েছিল তাতে পানি ভর্তি করার আগে পানির নিচে পাতলা পলিটিন দেওয়া হয়েছিল, যাতে করে নালার মাটি অতিদ্রুত পানি শুষে না নেয়।

দুই. নিমিত্ত ঘোষণার সময় সীমার চারপাশে খোঁড়া নালা থেকে হাতের তালুতে করে পানি নিয়ে, সেই পানি নিচের দিকে ছেড়ে দিতে দিতে নিমিত্ত ঘোষণা করা হয়েছিল।

তিন. সীমা প্রতিষ্ঠা করার সময় সংঘর্ষে বিহারের সকল ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন না, এবং যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না তাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক কোনোভাবেই ছন্দ আনা হয়নি।

উপরোক্ত তিনটি ঘটনাই বিনয়সম্মতভাবে বিশুদ্ধ বদ্ধসীমা প্রতিষ্ঠার কাজে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। কীভাবে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে সে-ব্যাপারে আমি যথাস্থানে আলোচনা করব। তার আগে সীমার ব্যাপারে প্রাথমিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা সেরে নেওয়া যাক।

২. সীমা কী ও কেন?

‘সীমা’ বলতে মূলত বদ্ধসীমা ও অবদ্ধসীমা এই দুই প্রকার সীমাকে বোঝায়।

‘অবদ্ধসীমা’ তিন প্রকার; যথা :

১) গ্রামসীমা (গামসীমা)

২) সপ্ত অভ্যন্তর সীমা (সত্তভ্যন্তরসীমা)

৩) জলনিষ্ক্ষেপ সীমা (উদকুক্ষেপসীমা)

উপরোক্ত তিন প্রকার অবদ্ধসীমা এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই সেগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হতে বিরত থাকলাম।

আর ‘বদ্ধসীমা’ মূলত এক প্রকার হলেও আট প্রকার সীমাচিহ্ন বা নিমিত্ত অনুসারে বদ্ধসীমাকে আট প্রকারে ভাগ করা যায়। সেই আট প্রকার সীমাচিহ্ন বা নিমিত্ত হলো :

১) পর্বত-নিমিত্ত (পর্বতনিমিত্ত), সাধারণত পর্বত-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘পর্বতসীমা’ বলা হয়।

২) পাথর-নিমিত্ত (পাশাণনিমিত্ত), সাধারণত পাথর-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘পাশাণসীমা’ বলা হয়।

৩) বন-নিমিত্ত (বননিমিত্ত), সাধারণত বন-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘বনসীমা’ বলা হয়।

৪) বৃক্ষ-নিমিত্ত (রুক্মনিমিত্ত), সাধারণত বৃক্ষ-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘বৃক্ষসীমা’ বলা হয়।

৫) মার্গ-নিমিত্ত (মগ্ননিমিত্ত), সাধারণত মার্গ-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘মার্গসীমা’ বা ‘পথসীমা’ বলা হয়।

৬) বল্মিক-নিমিত্ত (বল্মিকনিমিত্ত), সাধারণত বল্মিক-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘বল্মিকসীমা’ বলা হয়।

৭) নদী-নিমিত্ত (নদীনিমিত্ত), সাধারণত নদী-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘নদীসীমা’ বলা হয়।

৮) পানি-নিমিত্ত (উদকনিমিত্ত), সাধারণত পানি-নিমিত্ত ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দিলে তখন সেই বদ্ধসীমাকে ‘উদকসীমা’ বলা হয়।

রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধসীমাটিও উদক-নিমিত্ত বা পানি-নিমিত্ত

ঘোষণার মাধ্যমে সীমাচিহ্ন দেওয়া হয়েছিল, কাজেই আমাদের আলোচনাও কেবল সেটাকে ঘিরেই আবর্তিত হবে।

সমগ্র বিনয়পিটকে উল্লেখিত যেকোনো সংঘকর্ম করার সময় উপস্থিত ভিক্ষুদের অবশ্যই কোন সীমায় বসে সংঘকর্ম করছেন সেটি মাথায় রাখতে হয়। কারণ যে সীমায় বসে ভিক্ষুরা সংঘকর্ম করতে যাচ্ছেন সেই সীমার সকল ভিক্ষুকে হয় পরস্পরের হস্তপাশে (আড়াই হাতের মধ্যে) নিয়ে আসতে হবে, নতুবা উক্ত সংঘকর্মে যে-সকল ভিক্ষু অনুপস্থিত তাদের সবার কাছ থেকে হৃদয় নিয়ে আসতে হবে, সেটা বদ্ধসীমা কিংবা অবদ্ধসীমা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা না হলে উক্ত সংঘকর্মটি বিনয়সম্মতভাবে বিশুদ্ধ হয় না, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই বিষয়টি মাথায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থকথামতে, প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা ইত্যাদি সংঘকর্ম যাতে সুখে নির্বিঘ্নে সম্পাদন করা যায়, সেই লক্ষ্যেই মূলত ‘খণ্ডসীমা’ বা ‘বদ্ধসীমা’ প্রতিষ্ঠা করা উচিত (পব্বেজ্জুপসম্পদাদীনং সঙ্ঘকস্মানং সুখকরণং... খণ্ডসীমা বন্ধিতব্বা)।

এবার সংঘকর্ম সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়া যাক।

৩. সংঘকর্ম কত প্রকার ও কী কী?

পরিবার গ্রন্থমতে (পরিবা.৪৮২) ‘সংঘকর্ম’ চার প্রকার; যথা :

১) অপলোকনকস্মং—এই ‘অপলোকনকস্মং’ নামক সংঘকর্মটি সমগ্র সংঘের অনুমতির ভিত্তিতে তিনবার ঘোষণা করে সম্পাদন করতে হয়। যেমন : সেনাসনগ্গাহকসম্মুতি, মতকচীৰদানসম্মুতি, ইত্যাদি।

২) ঞ্জত্তিকস্মং—এই ‘ঞত্তিকস্মং’ নামক সংঘকর্মটি সমগ্র সংঘের অনুমতির ভিত্তিতে একবার মাত্র বিবৃতি (ঞত্তি) প্রদানের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। যেমন : উপোসথকস্মং, পবারণাকস্মং, ইত্যাদি।

৩) ঞ্জত্তিদুতিযকস্মং—এই ‘ঞত্তিদুতিযকস্মং’ নামক সংঘকর্মটি সমগ্র সংঘের অনুমতির ভিত্তিতে একবার বিবৃতি (ঞত্তি) প্রদান ও একবার অনুশ্রবণ (অনুস্সাৰন) করানোর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। যেমন : সীমাসম্মুতি, সীমাসমূহননং, কথিনদানং, কথিনুদ্ধারো, ইত্যাদি।

৪) **ঐতিচতুখকস্মৎ**— এই ‘ঐতিচতুখকস্মৎ’ নামক সংঘকর্মটি সমগ্র সংঘের অনুমতির ভিত্তিতে একবার বিবৃতি (ঐতি) প্রদান ও তিনবার অনুশ্রবণ (অনুস্মারন) করানোর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হয়। যেমন : তজ্জনীয়কস্মৎ, পরিবাসদানং, মানভদানং, উপসম্পদাকস্মৎ, ইত্যাদি।

এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা না দিয়ে শুধু এটুকুই বলব যে, আমাদের আলোচ্য উপসম্পদা-কর্মটি ঐতিচতুখকস্মৎ-এর মধ্যেই পড়ে। এই উপসম্পদা-কর্ম নামক সংঘকর্মটি সম্পর্কে আলোচনার আগে আমাদের এগারো প্রকার বিপত্তিসীমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

৪. এগারো প্রকার বিপত্তিসীমা

পরিবার গ্রন্থমতে (পরিবা.৪৮৬) বিপত্তিসীমা এগারো প্রকার; যথা :

- ১) অতিক্ষুদ্র সীমা (অতিখুদ্রকা)
- ২) অতিমহা সীমা (অতিমহতী)
- ৩) খণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট সীমা (খণ্ডনিমিত্তা)
- ৪) ছায়া সীমাচিহ্নযুক্ত সীমা (ছায়ানিমিত্তা)
- ৫) সীমাচিহ্নবিহীন সীমা (অনিমিত্তা)
- ৬) সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে সন্মত সীমা (বহিসীমে ঠিতসন্মত)
- ৭) নদীর মধ্যে সন্মত সীমা (নদিয়া সন্মত)
- ৮) সমুদ্রের মধ্যে সন্মত সীমা (সমুদ্রে সন্মত)
- ৯) প্রাকৃতিক হ্রদের মধ্যে সন্মত সীমা (জাতস্পরে সন্মত)
- ১০) সীমার মধ্যে সীমা মিশ্রিত করে সন্মত সীমা (সীমায সীমং সন্তিন্দন্তেন সন্মত)
- ১১) সীমার মধ্যে সীমা হিসেবে সন্মত সীমা (সীমায সীমং অজ্ঞোথরন্তেন সন্মত)

বিনয়সঙ্গহ-অট্টকথা গ্রন্থমতে এই এগারো প্রকার সীমার কারণে সংঘকর্মগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বলে এগুলোর নাম হচ্ছে **বিপত্তিসীমা**। (ইমেহি একাদসহি আকারেহি সীমতো কস্মানি বিপজ্জন্তীতি বচনতো এতা বিপত্তিসীমাযো নাম।)

বিনয়মতে এই এগারো প্রকার বিপত্তিসীমার কোনো একটিতে সংঘকর্ম করলে সেটি সফল হয় না, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সংঘকর্মটি অপরিশুদ্ধ হয়।

পরিবার-অট্টকথায় আরও বলা হয়েছে, “এই এগারো প্রকার সীমা হচ্ছে অসীমা (অর্থাৎ সীমা নয়), গ্রামক্ষেত্রসদৃশ, এই সমস্ত সীমায় বসে সংঘকর্ম করা হলে তা কুপিত হয়, দূষিত হয়।” (পরিবা.অট্ট.৪৮৬)

সে যা-ই হোক, এই নিবন্ধে আমি কেবল তৃতীয় বিপত্তিসীমা অর্থাৎ খণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট সীমা (খণ্ডনিমিত্ত) নিয়েই আলোচনা করব, বাকিগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

পরিবার-অট্টকথা গ্রন্থমতে খণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট সীমা (খণ্ডনিমিত্ত) বলতে সেই সীমাকে বুঝায় যার সীমাচিহ্নগুলো (নিমিত্ত) যুক্ত করা হয়নি। সীমার সীমাচিহ্নগুলো (নিমিত্ত) ঘোষণার সময়ে প্রথমে পূর্বদিকের চিহ্ন (নিমিত্ত) বলার পরে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের চিহ্ন বলে পূর্বদিকের আগে উক্ত চিহ্নটি পুনরায় বলে তারপরে থামতে হয়। এভাবেই সীমা অখণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট হয়। যদি ক্রমান্বয়ে বলতে বলতে উত্তর দিকের চিহ্ন বলে সেখানেই থামে, (অথবা তার আগেই কোনো একটি দিকের চিহ্ন বলে থেমে যায়,) তখন সেই সীমা খণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট (খণ্ডনিমিত্ত) হয়।

রাজবন বিহারের বর্তমান বদ্ধসীমাটিও এই খণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট বিপত্তিসীমার মধ্যেই পড়ে। সেটা কীভাবে এবার আমরা সে-আলোচনার দিকেই অগ্রসর হবো।

৫. রাজবন বিহারস্থ সীমার মূল সমস্যাটা আসলে কী?

রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান বদ্ধসীমাটিতে মূলত নিমিত্ত বা সীমাচিহ্নের সমস্যা। এ ব্যাপারে অর্থকথায় বলা হয়েছে, “তাই পর্বতচিহ্ন করার সময়ে জিঞ্জেস করা উচিত—‘পর্বতটি কি একাবদ্ধ, নাকি একাবদ্ধ নয়?’ যদি একাবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে একবারের বেশি সীমাচিহ্ন করা উচিত নয়। সেটাকে (অর্থাৎ সেই পর্বতটিকে) চারদিকে বা আটটি দিকে উল্লেখ করলেও ওই একবারই সীমাচিহ্ন হিসেবে উল্লেখিত

হয়ে থাকে। সে-कारणे কোনো বিহারকে চক্রাকারে ঘিরে থাকা পর্বত হলে সেই পর্বতকে কেবল একটি দিকে উল্লেখ করা উচিত। অন্যান্য দিকগুলোতে সেই পর্বতকে বাইরে রেখে এর মধ্যকার অন্যান্য চিহ্নগুলোকে (অর্থাৎ পাথর, বন, বৃক্ষ ইত্যাদি নিমিত্ত) উল্লেখ করা উচিত। এরপর থেকে পাথর-নিমিত্ত ইত্যাদির বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য (ইতো পরেসু পাসাণনিমিত্তাদীসুপি এসেব নযো)।” (মহাৰ.অট্ট.১৩৮; সীমা-বিনিচ্ছয়-কথা, বিনয়সঙ্গহ-অট্টকথা)

অতএব, রাজবন বিহারে সীমা প্রতিষ্ঠাকালীন সীমার চারপাশে এই যে নালা খুঁড়ে নালাভর্তি পানি দেওয়া হয়েছে, সেই পানি একাবদ্ধ হওয়ার কারণে এবং মাঝখানে কোনো বিভাজক রেখা না থাকার কারণে একই পানিকে নিয়মমাফিক আটবার নিমিত্ত ঘোষণা করা হলেও মাত্র একবার নিমিত্ত ঘোষণা করা হয়েছে বলে গণ্য হয়েছে। অথচ একটি বদ্ধসীমায় কমপক্ষে তিনটি কিংবা চারটি নিমিত্ত (সীমাচিহ্ন) লাগে, এর কম হলে তখন তা পরিশুদ্ধ সীমা হয় না। অর্থাৎ উক্ত সীমায় নিমিত্ত বা সীমাচিহ্নগুলো পরিপূর্ণ নয়। তাই রাজবন বিহারের সীমাটি তিন নম্বর বিপত্তিসীমা, অর্থাৎ খণ্ডিত সীমাচিহ্নবিশিষ্ট সীমায় (খণ্ডনিমিত্ত) পরিণত হয়েছে।

বিনয়পিটকের ‘পরিবার’ ও ‘পরিবার-অট্টকথা’ গ্রন্থমতে এই ধরনের বিপত্তিসীমায় উপসম্পদা-কর্ম ইত্যাদি যেকোনো সংঘকর্ম করলে তা সফল হয় না, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এককথায় এই ধরনের বিপত্তিসীমায় কোনো অনুপসম্পন্নকে উপসম্পদা দিলে সে ভিক্ষু হয় না, পরিবাস দিলে পরিবাস দেওয়া হয় না, মানত্ত দিলে মানত্ত দেওয়া হয় না, আহ্ৰান-কর্ম করলে আহ্ৰান করা হয়েছে বলে গণ্য হয় না, উপোসথ করলে উপোসথ হয় না, প্রবারণা করলে প্রবারণা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে এই ধরনের বিপত্তিসীমাগুলো যেহেতু অর্থকথায় গ্রামসীমাসদৃশ বলা হয়েছে, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই এগুলো গ্রামসীমা হিসেবে গণ্য হয়, তাই উক্ত বিপত্তিসীমাগুলোতে উপোসথ, প্রবারণা, পরিবাস-দান, উপসম্পদা-কর্ম ইত্যাদি সংঘকর্ম করার সময় উক্ত গ্রামসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সকল ভিক্ষুকে হস্তপাশে নিয়ে আসলে, অথবা সেখানে অনুপস্থিত ভিক্ষুদের কাছ থেকে ছন্দ নিয়ে আসলে, তখনো সেই

সংঘকর্মটি সফল হয়, পরিশুদ্ধ হয় ও বিনয়সম্মত হয়।

ধরা যাক, রাজবন বিহারের বদ্ধসীমাটি এগারো প্রকার বিপত্তিসীমার একটি। অর্থকথামতে, তখন তা স্বাভাবিকভাবেই গ্রামসীমায় পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই কোনো শ্রামণকে উপসম্পদা দেওয়ার সময় যদি সেই গ্রামসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সকল ভিক্ষুকে হস্তপাশে নিয়ে আসা হতো, অথবা যদি অনুপস্থিত ভিক্ষুদের সবার কাছ থেকে ছন্দ নিয়ে আসা হতো, তা হলেও কোনো সমস্যা ছিল না, তখন উপসম্পদা-কর্মটি সফল হতো, বিনয়সম্মত হতো, পরিশুদ্ধ হতো।

কিন্তু আমরা ভালো করেই জানি যে, ২০০৮ সালের পর থেকে নতুন বদ্ধসীমাটিতে যতবার উপসম্পদা দেওয়া হয়েছে ততবার এর কোনোটাই করা হয়নি। কাজেই উপসম্পদা-কর্ম নামক সংঘকর্মটিতে একদিকে যেমন বিপত্তিসীমার সমস্যা ছিল, অন্যদিকে পরিষদ-সম্পত্তির (পরিসম্পত্তি) সমস্যাও ছিল।

এ ছাড়াও, রাজবন বিহারে সীমা প্রতিষ্ঠাকালীন সীমার চারপাশে নালা খুঁড়ে নালাভর্তি পানি দেওয়ার আগে নিচে পাতলা পলিটিন দেওয়া হয়েছিল, সেটাও একটা সমস্যা। কারণ মহাবর্গ-অর্থকথামতে, শুকনো মাটিতে উদকনিমিত্ত ঘোষণার সময় নৌকা, কলসি, বালতি, গামলা, মগ ইত্যাদিতে পানি ভরে নিমিত্ত ঘোষণা করা যায় না। উদকনিমিত্ত হিসেবে ব্যবহৃত পানিকে মাটির ভেতরে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হয়। আলগা হলে উদকনিমিত্ত ঘোষণা করা যায় না। অথচ এখানে পানির নিচে পাতলা পলিটিন দেওয়া হয়েছিল। সেই পলিটিন মাটি থেকে পানিকে আলাদা করেছে। তাই নিচে পাতলা পলিটিন দেওয়ার কারণে সীমার চারপাশে থাকা নালাভর্তি পানি উদকনিমিত্ত হওয়ার যোগ্যই নয়।

ঠিক একই যুক্তিতে এই যে নিমিত্ত ঘোষণার সময় সীমার চারপাশে খোঁড়া নালা থেকে হাতের তালুতে করে পানি নিয়ে, সেই পানি নিচের দিকে ছেড়ে দিতে দিতে নিমিত্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটাতেও সমস্যা আছে। কারণ, অর্থকথামতে, উদকনিমিত্ত হিসেবে ব্যবহৃত পানিকে হতে হবে স্থির ও অপ্রবাহমান, অস্থির ও প্রবাহমান হলে হবে না।

৬. সীমার সমস্যাটা কি সামান্য, নাকি গুরুতর?

এককথায় বললে সীমার সমস্যাটা মোটেই সামান্য নয়, বেশ গুরুতর। কারণ, বিনয়পিটকের পরিবার গ্রন্থে বলা হয়েছে, “চত্বারি কন্মানি। অপলোকনকন্মং, ঐত্তিকন্মং, ঐত্তিদুতীয়কন্মং, ঐত্তিচতুথকন্মং - ইমানি চত্বারি কন্মানি। কতিহাকারেহি বিপজ্জন্তি? ইমানি চত্বারি কন্মানি পঞ্চহাকারেহি বিপজ্জন্তি - বথুতো বা ঐত্তিতো বা অনুস্সাবনতো বা সীমতো বা পরিসতো বা।” (পরিবা.৪৮২)

অর্থাৎ “সংঘকর্ম চার প্রকার। অপলোকন-কর্ম, জ্ঞাপ্তি-কর্ম, জ্ঞাপ্তি দ্বিতীয় কর্ম ও জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্ম—এই চার প্রকার সংঘকর্ম। এই সংঘকর্মগুলো কত প্রকারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়? এই চার প্রকার সংঘকর্ম পাঁচ প্রকারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যথা : বথু বা বিষয়ের কারণে (অর্থাৎ যোগ্য উপসম্পদাপ্রার্থীর কারণে), বা জ্ঞাপ্তির কারণে, বা অনুশ্রবণের কারণে, বা সীমার কারণে, অথবা পরিষদের কারণে।” মনে রাখতে হবে যে, এই নিবন্ধে আলোচ্য উপসম্পদা-কর্মটি হচ্ছে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্ম। এটি চার প্রকার সংঘকর্মের একটি।

অর্থকথায় এ বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, একজন ভিক্ষুর উপসম্পদার সময়ে পাঁচটি সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকতে হয়। সেগুলো হলো : বথুসম্পত্তি (যোগ্য উপসম্পদাপ্রার্থী), ঐত্তিসম্পত্তি (জ্ঞাপ্তি-সম্পত্তি), অনুস্সাবনসম্পত্তি (অনুশ্রবণ-সম্পত্তি), সীমাসম্পত্তি (সীমা-সম্পত্তি), পরিসসম্পত্তি (পরিষদ-সম্পত্তি)। এর কোনো একটিতে ত্রুটি হলেই সেই উপসম্পদা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন সেই ব্যক্তি অনুপসম্পন্নই থেকে যায়, অর্থাৎ তখন সেই ব্যক্তি ভিক্ষু হিসেবে গণ্যই হয় না। এতে ভিক্ষুত্ব নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কাজেই সীমার সমস্যাটা যে মোটেই হেলাফেলা করার মতো বিষয় নয়, আশা করি বুঝতে পারছেন।

শুধু যে সীমাসম্পত্তিতে ত্রুটি থাকলেই সেই ব্যক্তি অনুপসম্পন্ন থেকে যায় তা-ই নয়, অন্য চারটি সম্পত্তির কোনো একটিতে ত্রুটি থাকলেও সেই ব্যক্তি অনুপসম্পন্নই থেকে যায়। কাজেই সমস্যাটা কতটা গুরুতর সেটা বোঝার জন্য মস্ত বড়ো পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই।

তা ছাড়া, অর্থকথায় আরও বলা হয়েছে যে, উক্ত পাঁচ প্রকার সম্পত্তির কোনো একটিতে নিশ্চিত ভ্রুটি আছে জেনেও কোনো ভিক্ষু যদি পুনরায় উপসম্পদা না নিয়ে আগের মতোই ভিক্ষুজীবন যাপন করে এবং বর্ষা গণনা করে পূর্বের মতোই বন্দনা ইত্যাদি গ্রহণ করে, তখন সেটা তার জন্য মহাদোষাবহ হয় এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের অন্তরায় হয়। অর্থাৎ সেটা তার স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে উক্ত পাঁচ প্রকার সম্পত্তির কোনো একটিতে নিশ্চিত ভ্রুটি আছে বলে না জানলে দোষাবহ হয় না এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের অন্তরায়ও হয় না।

এ ব্যাপারে ষ্ট্রিন্যালঙ্কার-টীকায় সতর্ক করে বলা হয়েছে, “অন্যান্য ভিক্ষুরা যদি গ্রাম্য বিহার ইত্যাদিতে বসবাস করে, পণ্ডিত ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করে না, বথুসম্পত্তি ও বথুরিপত্তি কী তা ঠিকমতো জানে না, ঐতিহাসিক সম্পত্তি ও ঐতিহাসিকিপত্তি কী তা ঠিকমতো জানে না, অনুস্মারনসম্পত্তি ও অনুস্মারনরিপত্তি কী তা ঠিকমতো জানে না, সীমসম্পত্তি ও সীমরিপত্তি কী তা ঠিকমতো জানে না, পরিসসম্পত্তি ও পরিসরিপত্তি কী তা ঠিকমতো জানে না, কিন্তু বহুজনকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিয়ে নিজ পরিষদকে বড়ো করে, তারাও ভগবানের শাসনকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়, ধ্বংস করায়। তাই যেসব ভিক্ষু ভগবানের আদেশ-উপদেশ মেনে চলেন, লজ্জী, সুশীল, বহুশ্রুত, শিক্ষাকামী ও সৎপুরুষ, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের ভিক্ষুদের বন্ধু হওয়া উচিত নয়, সহায়তাকারী হওয়া উচিত নয়, এবং এই ধরনের ভিক্ষুদের সংসর্গ সযত্নে এড়িয়ে চলা উচিত।” (কম্মাকম্ম-বিনিচ্ছয়-কথা, ষ্ট্রিন্যালঙ্কার-টীকা)

এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উপসম্পদা-কর্মের পাঁচটি সম্পত্তি ও পাঁচটি রিপত্তি সম্পর্কে ঠিকমতো না জেনে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিলে তাদের দলবল ভারী হয় বটে, কিন্তু এর দ্বারা তারা আসলে বুদ্ধশাসনকেই পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং বুদ্ধশাসন ধ্বংসের জন্য দায়ী হয়। কাজেই সাধু সাবধান!

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, বুদ্ধের সময়কালে তো ‘এহি ভিক্ষু’ বলেও উপসম্পদা দেওয়া হয়েছে, ত্রিশরণ গ্রহণ করানোর মাধ্যমেও উপসম্পদা দেওয়া হয়েছে, সীমা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না, তাহলে রাজবন বিহারে উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে সীমাসংক্রান্ত

সমস্যা থেকে থাকলেও তাদের ভিক্ষুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে কেন? উপসম্পদার ক্ষেত্রে সীমা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই না।

ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার জন্য উপসম্পদা কত প্রকার এবং কোন কোন উপসম্পদা বর্তমানে চালু আছে, কোন কোন উপসম্পদা বর্তমানে চালু নেই, অর্থকথা ও টীকার আলোকে এসব বিষয় আগে জানা দরকার।

প্রথমে জানা যাক উপসম্পদা কত প্রকার ও কী কী?

পারাজিকা-অর্থকথা গ্রন্থমতে, উপসম্পদা আট প্রকার; যথা :
এহিতিকথূপসম্পদা, সরণগমনূপসম্পদা, ওবাদপটিগ্নহণূপসম্পদা, পঞ্হব্যাকরণূপসম্পদা, গরুধম্মপটিগ্নহণূপসম্পদা, দূতেনূপসম্পদা, অট্টবাচিকূপসম্পদা, ঐত্তিচতুথকম্মূপসম্পদা।

সারথদীপনী-টীকা গ্রন্থমতে, উপরোক্ত আট প্রকার উপসম্পদার মধ্যে ‘এহিতিকথূপসম্পদা’ হচ্ছে কেবল অস্তিমজন্মধারী সত্ত্বদের জন্য (অস্তিমভবিকানংযেব), ‘সরণগমনূপসম্পদা’ হচ্ছে পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য (পরিসুদ্ধানং), ‘ওবাদপটিগ্নহণূপসম্পদা’ ও ‘পঞ্হব্যাকরণূপসম্পদা’ হচ্ছে যথাক্রমে মহাকাশ্যপ স্থবির ও সোপাক স্থবিরদের জন্য, কারণ তাঁদের পক্ষে আর পারাজিকা ইত্যাদি লোকবজ্জ অপরাধ করা সম্ভব নয়। ‘গরুধম্মপটিগ্নহণূপসম্পদা’, ‘দূতেনূপসম্পদা’ ও ‘অট্টবাচিকূপসম্পদা’ কেবল ভিক্ষুগীদের জন্যই অনুমোদিত, ভিক্ষুদের জন্য নয়। আর ‘ঐত্তিচতুথকম্মূপসম্পদা’ সাধারণভাবে সকল ভিক্ষুর জন্যই অনুমোদিত।

বিনয়পিটকের মহাবর্গ গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তীকালে বুদ্ধ নিজে ত্রিশরণ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে উপসম্পদা প্রদান বাতিল করে সকল ভিক্ষুকে জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মের মাধ্যমে উপসম্পদা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন এভাবে :

“যা সা, ভিক্ষবে, মযা তীহি সরণগমনেহি উপসম্পদা অনুঞ্হাতা, তং অজ্জতগ্গে পটিকিখপামি। অনুজানামি, ভিক্ষবে, ঐত্তিচতুথেন কস্মেন উপসম্পাদেতুং।” (মহাব. ৬৯)

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশরণ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে আমি যেই উপসম্পদার অনুমোদন দিয়েছি, তা আজ থেকে বাতিল করছি। হে ভিক্ষুগণ, (আজ থেকে) আমি জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মের মাধ্যমেই উপসম্পদা প্রদানের অনুমোদন দিচ্ছি।

সারথদীপনী-টীকা গ্রন্থমতে, “ঐতিচতুর্থকম্পূসম্পদাই কেবল সর্বকালীন, এহিতিকৃৎপসম্পদা ইত্যাদি বাকিগুলো সর্বকালীন নয়।” কাজেই বাকিগুলো সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়, নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্যই কেবল প্রযোজ্য।

এ ব্যাপারে আরও বলা হয়েছে, “আট প্রকার উপসম্পদার মধ্যে ঐতিচতুর্থকম্পূসম্পদা, দূতেনূপসম্পদা ও অট্টবাচিকূপসম্পদা—এই তিন প্রকার উপসম্পদাই কেবল দৃঢ় (থাররা), বাকিগুলো বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই কেবল চালু ছিল, পরে সেগুলো আর চালু নেই।” মহাবর্গ গ্রন্থে বুদ্ধ নিজেই সেগুলো বাতিল করে দিয়েছিলেন, এই কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি।

এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বর্তমানে একমাত্র জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্যের মাধ্যমেই উপসম্পদা দেওয়া যায়, অন্য কোনোভাবে নয়। উপসম্পদা প্রদানের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো বর্তমানে (বুদ্ধের পরিনির্বাণ-পরবর্তী সময়ে) সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে গেছে।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি এবং আবারও বলছি যে, অর্থকথামতে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর এই জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্যের মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ ভিক্ষু হতে গেলে তার অবশ্যই নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় বা সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকতে হয়; যেমন : ১) বথুসম্পত্তি (যোগ্য উপসম্পদাপ্রার্থী), ২) ঐতিসম্পত্তি (জ্ঞাপ্তি-সম্পত্তি), ৩) অনুস্সাবনসম্পত্তি (অনুশ্রবণ-সম্পত্তি), ৪) সীমাসম্পত্তি (সীমা-সম্পত্তি) ও ৫) পরিসসম্পত্তি (পরিষদ-সম্পত্তি)।

এই পাঁচটি সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকলে তবেই একজন উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তি এই বুদ্ধশাসনে একজন পরিপূর্ণ ভিক্ষু হবে, অন্যথায় সে অনুপসম্পন্নই থেকে যাবে।

জ্ঞাপ্তি চতুর্থ কর্মবাক্যের মাধ্যমে উপসম্পদা প্রদানের সময় কীভাবে উপরোক্ত পাঁচটি সম্পত্তি পরিপূরণ করতে হয় সে-বিষয়ে অর্থকথায় বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিনয়গারবী ভিক্ষুমাত্রই অর্থকথা ও টীকা অনুসারে উক্ত পাঁচটি সম্পত্তির বিষয়গুলো ঠিকমতো মেনে চলবেন, এটাই একান্তভাবে প্রত্যাশিত।

৭. এক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় কী?

উপসম্পদার সময়ে পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার সম্পত্তিতে কোনো ত্রুটি থাকলে সেটাকে বিনয় মোতাবেক সংশোধন করতে হবে। আর সেই ত্রুটিগুলো সংশোধনের উপায়টা হচ্ছে পুনরায় উপসম্পদা-কর্ম সম্পাদন করা। অর্থকথায় সেটাকে ‘দল্হীকস্মং’ বলা হয়। এর মাধ্যমে তার সেই পুরোনো উপসম্পদায় কোনো ত্রুটি থাকলে তা দূরীভূত হয় এবং কোনো ত্রুটি না থাকলে পুরোনো উপসম্পদার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়। এখানে ‘দল্হীকস্মং’ মানে হচ্ছে পুরোনো উপসম্পদা-কর্মকে আরও দৃঢ় করা।

বিষয়টিকে আরেকটু খোলাসা করা যাক। বিনয়ালঙ্কার-টীকা গ্রন্থমতে, উপসম্পদাকালে কর্মবাক্য বলার সময়ে ‘ঐত্তি’ (জ্ঞাপ্তি) ও ‘অনুস্মাৰন’ (অনুশ্রবণ)-জনিত ত্রুটি হতে পারে। সেই ত্রুটি এড়ানোর জন্য কর্মবাক্য বারবার বলা উচিত। এতে সেই কর্মবাক্য-সংশ্লিষ্ট ত্রুটি সংশোধন করা যায়। (তাই তো কাউকে উপসম্পদা প্রদানের সময় দু-তিনজন ভিক্ষু মিলে দুই কি তিনবার করে একই উপসম্পদা-কর্মবাক্য পাঠ করতে দেখা যায়।)

কিন্তু উপসম্পদার সময়ে নিজেদের অজান্তে অন্যান্য ত্রুটিও তো হতে পারে। সেই ত্রুটিগুলো কী কী? বখুৰিপত্তি (উপসম্পদাপ্রার্থী-সংশ্লিষ্ট ত্রুটি), সীমারিপত্তি (সীমা-সংশ্লিষ্ট ত্রুটি) ও পরিসরিপত্তি (পরিষদ বা সংঘ-সংশ্লিষ্ট ত্রুটি)। এই সমস্ত ত্রুটি থাকলে তখন তা সেই মুহূর্তে বারবার কর্মবাক্য বলেও শোধরানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মাতৃগর্ভসহ বিশ বছর পূরণ হয়নি এমন কাউকে উপসম্পদা দেওয়া হলো। সে-রকম হলে তা হয় বখুৰিপত্তি (উপসম্পদাপ্রার্থী-সংশ্লিষ্ট ত্রুটি)। তখন সেই মুহূর্তে বারবার কর্মবাক্য বলেও সেই ত্রুটি শোধরানো যায় না। সে অনুপসম্পন্নই থেকে যাবে। কারণ বারবার কর্মবাক্য বললে তো আর তার বয়স বিশ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে না। কিন্তু কয়েক বছর পরে যদি পুনরায় তার উপসম্পদা কর্মবাক্য বলা হয়, তখন তার বয়সজনিত ত্রুটি সংশোধন হয়ে যায়, কারণ তখন সে এমনিতেই বিশ বছর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এই কারণেই মূলত দল্হীকস্মং করা হয়ে থাকে। এতে প্রথমবারে উপসম্পদার সময়ে কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে পরেরবার সেটার সংশোধন হয়।

এরপর বিনয়ালঙ্কার-টীকা প্রশ্ন তুলেছে, তখন কি সে আবার নবীন

ভিক্ষু হয়ে যাবে? না, হবে না। কেন? তার উত্তর সে নিজেই দিয়েছে এভাবে : “পোরাণসিক্খং অঙ্গচ্ছক্খিত্বা তায় এষ পতিট্ঠিতত্তা।” অর্থাৎ পুরোনো শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান না করে তার ভিত্তিতেই ভিক্ষুত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে বলে। খেয়াল রাখুন, বিনয়ালঙ্কার-টীকা প্রথমে বলে দিয়েছে যে দল্হীকস্মের পরে নবীন ভিক্ষু হয়ে যায় না। পুরোনো ভিক্ষুত্বই রয়ে যায়। এটা হচ্ছে সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কিন্তু তারপরেও বিশেষ একটি ক্ষেত্রে নতুন করে বর্ষা গণনা করা উচিত। তা ব্যাখ্যা করার জন্য আবার প্রশ্ন তুলেছে : “এবং সন্তেপি পুরেকতকস্মস্স সম্পজ্জনভাৰেন তিট্ঠন্তে সতি তায় ঠিতত্তা অদহরো সিয়া। পুরিমকস্মস্স অসম্পজ্জনভাৰেন ইতানি কতকস্মেযেৰ উপসম্পদাভাৰেন তিট্ঠন্তে সতি কস্মা দহরো ন ভৰেয্যা?”

তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে এ-রকম : এমনটি হলেও পুরোনো উপসম্পদা-কর্মটি সফল হলে তার ভিত্তিতে সে নবীন ভিক্ষু হয়ে যাবে না তা ঠিক আছে। কিন্তু পুরোনো উপসম্পদা-কর্মটি যদি সফল না হয় এবং বর্তমানে কৃত উপসম্পদা-কর্মবাক্যের দ্বারাই যদি তার উপসম্পদা সফল হয়, তা হলে সে নবীন ভিক্ষু হয়ে যাবে না কেন?

তখন বিনয়ালঙ্কার-টীকা তার রায় দিয়েছে এভাবে : “এবং সন্তে দহরো ভৰেয্যা।” অর্থাৎ এমনটি হলে সে নবীন ভিক্ষু হয়ে যাবে।

এরপরে বিনয়ালঙ্কার-টীকা প্রশ্ন তুলেছে : “এবং দহরো সমানো পুরিমসিক্খায় বস্সং গণেত্তা যথাবুড্ঢং বন্দনাদীনি সম্পটিচ্ছন্তো মহাসাৰজ্জো ভৰেয্যাতি?” অর্থাৎ এভাবে নবীন ভিক্ষু হয়েও পুরোনো উপসম্পদার ভিত্তিতে বর্ষা গণনা করে সেই পুরোনো বর্ষা অনুযায়ী বন্দনা ইত্যাদি গ্রহণ করলে তা কি তার জন্য মহাদোষাবহ হবে?

তার উত্তরে বিনয়ালঙ্কার-টীকা বলেছে : “এবং পুরিমসিক্খায় অট্ঠিতভাৰং পচ্ছিমসিক্খায় এষ লদ্ধুপসম্পদভাৰং তথতো জানত্তো এবং করোত্তো সাৰজ্জো হোতি।” অর্থাৎ এভাবে পুরোনো উপসম্পদা-কর্মটি সফল হয়নি এবং পরবর্তীকালে নেওয়া দল্হীকস্মের ভিত্তিতেই উপসম্পদা সফল হয়েছে বলে সত্যিই জানলে, আর সেভাবে জেনেও পুরোনো বর্ষা অনুযায়ী বন্দনা ইত্যাদি গ্রহণ করলে তখন তা দোষাবহ হয়।

কিন্তু এরপর বিনয়ালঙ্কার-টীকা বলছে, “এবং পন অজানন্তো ‘পুরিমসিক্‌থায়মেব ঠিতো’তি মজ্জিৎত্বা এবং করোন্তো অনবজ্জোতি বেদিতক্কো।” অর্থাৎ সে-রকম না জেনে ‘পুরোনো উপসম্পদাতেই স্থিত আছি’, বা পুরোনো উপসম্পদা-কর্মটি সফল হয়েছে বলে মনে করে সেই পুরোনো বর্ষা অনুযায়ী বন্দনা ইত্যাদি গ্রহণ করলে কোনো দোষ হয় না বলে বুঝতে হবে।

উল্লেখ্য, একজন উপসম্পদাপ্রার্থীর উপসম্পদা-কর্ম তখনই সফল হয় যখন সেই উপসম্পদা-কর্মে বখুসম্পত্তি ইত্যাদি পাঁচটি অঙ্গ বা সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকে। এর কোনো একটিতে ত্রুটি থাকলে তা সফল হয় না।

মোদ্ধা কথা হচ্ছে, কারো মনে যদি তার উপসম্পদার সময়ে পাঁচটি সম্পত্তি ঠিক ছিল কি না সন্দেহ জাগে, কিন্তু কোনো ত্রুটি ছিল বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হয়, অথবা কারো মনে যদি পুরোনো উপসম্পদা-কর্মটিকে আরও সুদৃঢ় করার ইচ্ছা জাগে, তখন তার দল্‌হীকস্মং করলেই হবে।

কিন্তু, তার উপসম্পদার সময়ে পাঁচটি সম্পত্তির যেকোনো একটিতে ত্রুটি ছিল বলে যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, তখন তাকে অবশ্যই পুনরায় উপসম্পদা নিতে হবে। তখন সে নবীন ভিক্ষু হয়ে যাবে এবং নতুন করে তাকে আবার বর্ষা গণনা করতে হবে।

এক কথায়, পুরোনো উপসম্পদার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকলে দল্‌হীকস্মং করলেই হবে, কিন্তু পাঁচটি সম্পত্তির কোনো একটিতে ত্রুটি ছিল বলে নিশ্চিত হলে তখন পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করতে হবে।

৮. উপসংহার

সবশেষে বলতে চাই—বিপত্তিসীমা, দল্‌হীকস্মং, পুনরায় উপসম্পদা ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা বার্মা ও শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু পণ্ডিত ভিক্ষুর সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা এ ব্যাপারে বার্মার পরিয়ত্তি শিক্ষার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান মহাবিহারের অভিজ্ঞ সেয়াদগণের সঙ্গে কথা বলেছি, পা-অক মেডিটেশন সেন্টারের অভিজ্ঞ সেয়াদের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় অবস্থানরত আমেরিকান ভিক্ষু অত্যন্ত বিনয়শীল ও বিনয়গারবী সুভূতি

ভক্তের সঙ্গেও কথা বলেছি, যিনি আবার বার্মার বিখ্যাত কন্সট্রাক্টর। পা-অক সেয়াদের সরাসরি শিষ্য। তাঁরা সবাই আমাদের বলেছেন, সীমায় যদি নিশ্চিত সমস্যা থাকে, অর্থাৎ সীমাটি যদি নিশ্চিতভাবেই বিপত্তিসীমার অন্তর্গত হয়, তাহলে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করতে হবে, নতুন করে বর্ষা গণনা করতে হবে। এর অন্যথা করার কোনো সুযোগ নেই।

তবে উপসম্পদার সময়ে সীমাসম্পত্তি ইত্যাদি পাঁচটি সম্পত্তিতে সমস্যা থাকতে পারে সন্দেহ জাগলে তখন দল্হীকস্মং করলেই হবে, বর্ষা ঠিক থাকবে অর্থাৎ নতুন করে বর্ষা গণনা করতে হবে না। এমনকি ইচ্ছা করলে মনে সন্দেহ না জাগলেও এমনিতেই বিনয়ধর ভক্তদের মাধ্যমে দল্হীকস্মং করা যায়। এ ব্যাপারে বিনয়ালঙ্কার-টীকা বলেছে, “আচার্যবরা একপুঙ্গলম্পি অনেককথত্বং উপসম্পদকস্মং করোন্তি।” অর্থাৎ সেরা আচার্যগণ একজন ব্যক্তিকে অনেকবার উপসম্পদা দেন। এক্ষেত্রে বর্ষা কমার কোনো আশঙ্কা নেই, নবীন ভিক্ষু হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

এ কারণেই বার্মায় হরহামেশা বিনয়গারবী ভিক্ষুদের নিজেদের উপসম্পদা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে দল্হীকস্মং করতে দেখা যায়। আমি শুনেছি, বিখ্যাত কন্সট্রাক্টর। পা-অক সেয়াদও তাঁর জীবনে মোট দশ-পনেরো বার দল্হীকস্মং করেছেন। বিনয়গারবী ভদন্ত সুভূতি ভক্ত জীবনে তিনবার দল্হীকস্মং করেছেন। বিনয়গারবী ভিক্ষুদের দল্হীকস্মং করাটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। সেই স্বাভাবিক বিষয়টিকে আমরা এদেশে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি না, এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা।

শ্রদ্ধেয় সিনিয়র ভক্তের কেউ কেউ অবশ্য এতে করে পূজ্য বনভক্তের ও তাঁর শিষ্যদের সম্মানহানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আমরা মনে করি, বিনয়ের প্রতি সম্মান দেখালে পূজ্য বনভক্তের ও তাঁর শিষ্যদের সম্মানহানি তো হবেই না, বরং সম্মান আরও উত্তরোত্তর বাড়বে।

আমরা সবাই জানি যে, পূজ্য বনভক্তে নিজে তাঁর ধর্মদেশনায় বলতেন, “তোমাদের সবাইকে ভালো করে ত্রিপিটক পড়তে হবে, ত্রিপিটকের শিক্ষা অনুযায়ী চলতে হবে, তবেই তোমরা নির্বাণ যেতে পারবে।” তাহলে এক্ষেত্রে পূজ্য বনভক্তের কথার ব্যত্যয় ঘটবে কীসের

ভিত্তিতে? মহান ভিক্ষুসংঘের কাছে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা।

বিনয়ের প্রতি যথাযথ সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করে মাত্র কিছুদিন আগেই স্নেহভাজন জ্ঞানশাস্ত্র ভিক্ষুও কম্বট্ঠানাচারিয়া ভদন্ত রেবত সেয়াদের কাছে নতুন করে শ্রামণ হয়ে পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করেছেন। কাজেই মন থেকে সমস্ত ইগো ও অহেতুক আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, বুদ্ধ-প্রজ্ঞাপিত বিনয়ের প্রতি যথাযথ সম্মান ও গৌরব প্রদর্শন করে, অপরিশুদ্ধ সীমাটি বিনয়সম্মতভাবে ঠিক করা উচিত এবং সেই সীমায় উপসম্পদা নেওয়া ভিক্ষুদের নতুন করে উপসম্পদা প্রদান করা উচিত। আমরা মনে করি, এক্ষেত্রে নিজেদের ইগোর কথা ভাবা উচিত নয়, আমাদের ভাবা উচিত আমাদের সীমা ও উপসম্পদা বিনয়সম্মত কি না। পরম পূজনীয় মহান ভিক্ষুসংঘের কাছে এটাই আমাদের আকুল প্রার্থনা। আশা করি মহান ভিক্ষুসংঘ আমাদের এই আকুল প্রার্থনা সুনজরে দেখবেন, বিনয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবেন।

ভুল হলে মাননীয় ভিক্ষুসংঘের কাছে আমি করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনুকম্পাপূর্বক আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, অনুকম্পাপূর্বক আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, অনুকম্পাপূর্বক আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

* * *